স্বজন
বন্ধু
অনুরাগী

আমেরিকার হিউস্টনে রবীন্দ্র মূর্তির পাদদেশে সুরে সুরে শ্রদ্ধাঞ্জলি

Forever in our Hearts: Honouring the Beautiful Life and Enduring Legacy of Mou Roychowdhury—my Boudi

Dr. Sanku Bose

In the grand tapestry of life, there are certain threads woven so intricately together that their presence becomes an integral part of our very existence. Such was the bond of friendship I shared with Mou Boudi. As I sit here today, grappling with the weight of her absence, I find solace in the kaleidoscope of memories of the moments I was fortunate enough to spend with her. And every moment seems to sparkle with the light of the unconditional love, faith and trust that she bestowed upon me. I can only hope that, in her eyes, I had managed to live up to her expectations.

It seems like yesterday that I first met her, yet it was almost 22 years ago. I was living in the USA, and my close involvement with the annual North American Bengali Conference (Banga Sammelan) was the grand catalyst that first brought us together. I can vividly recollect the day I first met Mou Boudi at their Salt Lake residence.From the first moment our paths crossed, a bond was forged that time could never erode. She loved and cherished the arts and culture of Bengal and this was the shared passion that first helped our friendship to blossom. She started calling me “Sanku” and I called her “Boudi” and these terms of endearment seemed to further strengthen the kinship that we shared. It was years later that she found out that I was actually many years elder to her, but by then our brother-sister bond was so strong that neither of us were comfortable with any other form of addressing each other.

With time, as I came to India or she went to the USA, our meetings became more frequent. They travelled every year for the NABC. When I was made the Secretary of the NABC in 2006 and then the President in 2015, the entire cultural extravaganza was planned and organized by Boudi. What surprised me was that she seemed to be on first name terms with almost all the performing artists and film personalities from Kolkata. Such was her love of Bengali culture. Once, she cooked at my place in Houston and I found out that her love for cooking is just as strong as her love for the arts.

Neither of us seemed to realize how or when our initial professional contacts metamorphosized into this beautiful sibling relationship. Every year, on Rakhi, regardless of whether I was in Houston or London or for that matter anywhere else in the world, Boudi made sure that my Rakhi reached me well in time. Without fail.Ever. She seemed to take offence if I didn't call her for a few days. But once I did, and she was done with her admonishments, we were back to being friends again. I never knew how she gained such loving authority over my life, as only a sister can—but she did. And I remain ever grateful that she considered me worthy of such sisterly affection.

No wonder then that she took quite an offence when I came back to India and joined J.K. Group in 2016. And she made her displeasure over this very clear to me--on multiple occasions. To her it was unimaginable that I chose to relocate to India and yet decided not to work with her at Techno India Group. Understandably, she was elated when I joined TIG in 2020. She was the Co-Chairperson, and I an employee—but that never seemed to be a factor in our relationship. In Kolkata, every occasion, be it my birthday or her's, Rakhi or Bhai Fonta—her warmth and affection touched me deeply. Every evening, she used to call me to know about the day and share her insights on how best to address issues at TIG. These hour-long calls were something to look forward to and helped me immensely to better understand and appreciate the culture at TIG. She bestowed me with absolute trust and faith in my new role. And for her faith in me, I remain eternally grateful. To everyone else here at TIG, she was their "Madam" but for me she always remained my Mou Boudi—my loving sister.

For the last two days of her life, amidst the beeping monitors of the ICU, I stood vigil by her bedside, witnessing her relentless battle between life and death and, in hindsight, praying for the impossible. Despite the best efforts of the doctors, the cruel hands of fate refused to relent, and in the end, we were left with only shattered hopes and a profound sense of loss.

As I grapple with the magnitude of her absence, as do many others who loved her, the void left in my heart serves as a poignant reminder of the fragility of existence and the impermanence of earthly possessions. To me, it seems unfair that my dearest friend, who had such a zest for life, has been torn away from us so suddenly and so cruelly. But such is destiny—and we have to live with it.Though she will no longer walk beside me, no longer call me in the evenings that seem to stretch endlessly, her essence of sisterly affection lingers in every corner of my heart.

Farewell, my dear sister. Though you may be gone from this world, your love will live on in my heart forever. Until we meet again, may you rest in peace knowing that you are deeply loved and profoundly missed.

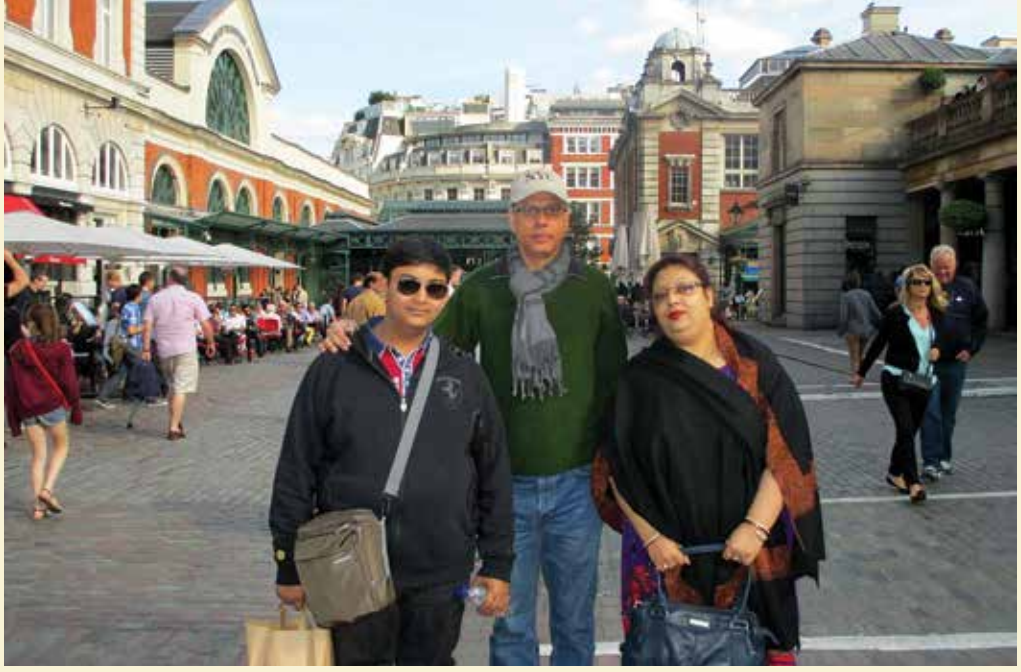

যেখানেই থাকো, রাজরানি হয়ে থাকো...

ভাস্কর রায়

গত কয়েক দিন ধরে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের বিভিন্ন কলেজ-অফিসে মৌ-কে ফ্রেমবন্দি করে তারই স্মরণসভায় যোগ দেওয়ার জন্য ঘুরছি। এটা যে কী ভীষণ, মর্মান্তিক বিষয়, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমাদের সহজাত দাদা-বোনের সম্পর্ক ছিল। সহজাত সম্পর্কের একটা মাধুর্য থাকে। আমাদের মধ্যেও রাগ-দুঃখ-মান-অভিমান-মনকষাকষি ও পারস্পারিক শাসনের ঊর্ধ্বে একটা তীব্র ভালবাসার টান ছিল। ও আমার জীবনে কখনও মৌ, কখনও দিদিভাই, কখনও অন্নপূর্ণা মা। আমার অজান্তেই কখন যে আমার জীবনের নোঙর হয়ে গিয়েছিল, তা নিজেই বুঝতে পারিনি। গত চার দশক ধরে একা থাকি শিলিগুড়িতে। যে কোনও পুজো-পার্বণের আগে অবধারিত ফোন আসত, 'কী করবে ওখানে একা একা? চলে এসো।' ঘরোয়া অনুষ্ঠানে তালিকায় প্রথমেই নাম। শোবার ঘরের সোফায় বসেই চলত আমাদের ভাই-বোনের অধিকাংশ আড্ডা। আমাদের পারস্পরিক আলোচনায় সত্যমকে আমরা 'ছোটবাবু' বলেই উল্লেখ করতাম। প্রায়ই বলত ও, 'তোমরা পারো বটে! কীসের যে এত গল্প!' আমি কিন্তু দীর্ঘ সময়ের এই গল্পের মধ্যেই আবিষ্কার করেছিলাম এক মৌ-কে, যার মধ্যে লুকিয়ে আছে এক শিশু, এক বিচক্ষণ প্রশাসক। দ্বিচারিতা একেবারে সহ্য করতে পারত না। কাউকে ভাল লাগা বা না-লাগার মধ্যে কোনও কৃত্রিমতা ছিল না। একই সঙ্গে মৌ একজন ক্ষমাশীলা, সহমর্মিতার নিদর্শন। সমাজের বিভিন্ন প্রান্তের বহু মানুষ, যাঁরা ওর সঙ্গে শৈশব থেকে জড়িয়ে আছেন, সকলের জন্য ছিল উষ্ণতার হাত। এই তো, ২০ এপ্রিল, দীর্ঘক্ষণ কথা হল। মেসেজ চালাচালি হল। কোনও এক ঘটনার প্রেক্ষিতে লিখল, 'একটু লুকোচুরি খেলতে ইচ্ছে হল।' তা বেশ! ইচ্ছে হতেই পারে! তাই বলে আমাদের সকলকে ছেড়ে, শোকসাগরে ভাসিয়ে, না ফেরার দেশে লুকিয়ে পড়া কি ঠিক হল? যেখানেই থাকো, রাজরানি হয়ে থাকো।

ভালো থেকো ‘মৌ’

করুণাকান্ত মণ্ডল

৭ মে, ২০২৪। সকাল ৮টা নাগাদ মোবাইলে একটা ফোন এল। না, সেটা মৌ-এর মৃত্যুসংবাদ ছিল না। সংবাদদাতা বলল, শুনেছিস, মৌ নাকি এই মুহূর্তে ভেন্টিলেশনে। খবরটা শুনে মনটা কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। তারপর আবার কোনও একজনকে ফোন করলাম। ফোনের ও-প্রান্ত থেকে জবাব এল, ‘মৌ আর নেই।’ এই খবরটা শোনা মাত্র শরীর ও মনের ওপর একটা বাজ পড়ল মনে হল। প্রায় ১০ মিনিট সোফায় চুপ করে বসে ছিলাম। কথা বলতেও পারছিলাম না।

বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে সল্টলেক আমরি হাসপাতাল, তারপর এফই-৪৯৮। মৌ-এর সঙ্গে শেষ দেখা ও কথা হয় ১৭ মার্চ ২০২৪। হোয়াটসঅ্যাপে মৌ-এর মেসেজ এল ওই দিনই দুপুর ঠিক তিনটের সময়, ‘সুনন্দাকে নিয়ে ঠিক সন্ধে ৭টার সময় চলে আয়, ঘুরতে বেরোব।’ যথাসময়ে পৌঁছেও গেলাম এবং মৌ-এর ইচ্ছেতে ঘুরতে বেরোনোও হল। গন্তব্য কিছু ঠিক ছিল না যদিও। গাড়ি গিয়ে থামল দিল্লি রোডের ধারে একটি ধাবা/রেস্টুরেন্টে। প্রায় ঘণ্টা দুয়েকের আড্ডা ও নৈশভোজ সেরে বাড়ি ফিরে এলাম।

এর আগে ভাইফোঁটা বা রাখি উপলক্ষে ফেসবুকে মৌ-কে নিয়ে কিছু কিছু আবোল তাবোল যে লিখিনি তা নয়, সেই সব ক’টা লেখা মৌ পড়েছে এবং ফোন করে বলেছে, ‘করুণাদা, তুই তো ফাটিয়ে দিয়েছিস।’ এই আবোল তাবোল লেখার অবশ্য একটা কারণ ছিল, সামনাসামনি যখনই আমাদের আড্ডা হত, যে কোনও কারণেই সেই সব আড্ডায় মৌ-এর হিট লিস্টে একটা নামই উঠে আসত, আর সেটা ছিল ‘করুণা’। কোনও আড্ডায় ইস্যু না থাকলেও সেদিনও ‘করুণা ইস্যু’ তৈরি করা হত আড্ডার তাগিদে।

মৌ-এর কথা লিখতে গেলে কয়েক রাত কেটে যাবে, তা-ও হয়তো শেষ হবে না। ১৯৯৭ সালের ২৭ নভেম্বর আমার বিয়ের দিন। ব্যান্ডেল স্টেশন থেকে আমরা ট্রেন ধরলাম। তুফান এক্সপ্রেস। গন্তব্য দুর্গাপুরে মৌ-এর মাসির বাড়ি। ট্রেনে সকলে মিলে ঝালমুড়ি খাওয়া, তারপর মাসির বাড়ি পৌঁছে মাছের ঝোল, ভাত ইত্যাদি ইত্যাদি। সন্ধেবেলায় মৌ লেগে পড়ল আমাকে মেক-আপ করাতে ও সাজাতে। আমরা যারা সত্যমের হুগলির বন্ধু,

তারা সকলেই বন্ধু হয়েছিলাম নয়ের দশকের গোড়ার দিকে। মৌ–এর সঙ্গেও আমাদের বন্ধুত্ব হয় ওই একই সময়। পরের বছর আমাদের মধ্যে অনেককেই মৌ ভাইফোঁটা দিয়ে দাদার আসনে বসিয়ে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে কখন যে ও আমাদের সকলের দিদি হয়ে যায় আমরা বুঝতেও পারিনি।

তখন কিন্তু এত প্রাচুর্য ছিল না। চ্যাটার্জি বিল্ডিংয়ের একটা দশ ফুট বাই দশ ফুটের অফিস থেকে আজকের 'টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ' নামক মহীরুহতে পরিণত হতে সময় লেগেছে দুই বা তিন দশক। এরই মাঝে সত্যমের কলকাতায় চলে আসা। কিন্তু তাতে কী! সপ্তাহের শেষে তখন ওরা হুগলিতেই চলে আসত। কলকাতাতেও ওদের একটা জগৎ তৈরি হতে থাকল একই সঙ্গে। সেখানেও মৌ–এর ভূমিকা প্রায় একই ছিল। যে কাজটা মৌ এতদিন করে গেছে সেটা হল, মৌ কখনও আমাদের বয়সটাকে বাড়তে দেয়নি। কর্পোরেট জগতে তখন সত্যম 'স্যর' ও মৌ 'ম্যাডাম' হয়ে গেছে, পরবর্তী সময় সত্যম তার বিশ্ববিদ্যালয়ের (এসএনইউ) আচার্য হয়েছে। মৌ–এর কাছে কোনও প্রোটোকলের বেড়াজাল অন্তত আমাদের জন্য কলকাতাতেও ছিল না। শুধু একটা ফোন, তারপরই মৌ বলত, ঠিক আছে, কাজ মিটিয়েই চলে আয়। আজ অনেক কথা মনে পড়ছে, কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা লিখব ঠিক করতে পারছি না। আজকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জগতে সব কিছুই নাকি মাপা যায় এবং যা যা মাপা যায় তার একটা একক থাকে। যেমন বুদ্ধি মাপার একক আইকিউ। তবে মনোবিজ্ঞানে মানুষের মন মাপা যায় কি না আমি জানি না। আর যদি মাপাও যায় তবে তার একক কী? সেটাও জানি না। আমাদের প্রত্যেকেরই একটা মন আছে। তবুও আজ অকপটে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, আমাদের অনেকের থেকেই অনেক বড় মনের মানুষ ছিল মৌ।

একদিন সত্যম বলেছিল, 'বুঝলি করুণা, পৃথিবী ছাড়াও একটা জগৎ আছে, আর সেই জগৎটা পৃথিবীর থেকে অনেক অনেক ভাল। আমরা সবাই মৃত্যুর পর সেখানেই যাব।' সকলকে ছেড়ে খুব তাড়াতাড়ি সেই ভাল জগতে পাড়ি দিল মৌ। নতুন জগতে খুব ভাল থেকো।

— তোমার করুণাদা।

মৌদির কাছে অনেক ঋণ...

সুনন্দা মণ্ডল

'কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি'

সেই প্রভাতে সত্যি তুমি নেই এটা মেনে নিতে খানিকটা সময় লেগে গেল। ৭ মে, তোমার চলে যাওয়ার খবরটা পাওয়ার পর থেকে বুকের মধ্যে একটা চাপা ব্যথা অনুভব করছি। কোন দেখাটা আমাদের শেষ দেখা হবে, বা তোমার আমার কোন কথাটা শেষ কথা হবে আমরা জানি না। অদ্ভুত রকম ভাবে আজ একটা কথা বারবার মনে পড়ছে। ১২ মার্চ মৌদির জন্মদিনে শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়ে ফেসবুকে আমি একটা পোস্ট করেছিলাম। কোনওদিনও এমনটা করিনি, হঠাৎ সেদিন মনে হল তাকে নিয়ে কিছু লিখি। ওদের কাছে আমার অনেক ঋণ। লেখার মধ্যে একটা লাইন ছিল, 'ক্রমশ সময় বয়ে চলেছে, কবে বলার সুযোগ হয় না হয়'। এখন ভাবছি ভাগ্যিস বলেছিলাম। ওই পোস্ট দেখার পর হোয়াটসঅ্যাপে মৌদি আমাকে দু-চার লাইন লিখেছিল, 'কেন পাগলের মত অত কথা ওখানে লিখেছিস? তোর লেখাটা পড়তে পড়তে বারবার চোখে জল আসছিল, আজ তুই আমাকে খুব কাঁদালি। ওরে তোদেরকে আমি ভালোবাসি তাই সবাইকে নিয়ে ভালো থাকতে চাই। তোর মনটা অনেক বড়, তাই এত বড় করে দেখিস। আজ আমাকে তুই খুব লজ্জা দিলি এত কিছু লিখে'। এই ছিল মৌদির কাছ থেকে পাওয়া আমার শেষ চিঠি বা শেষ উপহার, আশীর্বাদ স্বরূপ ওই লেখা স্মৃতির খাতায় রাখা থাকবে।

আমাদের সবাইকে নিয়ে তোমার আর ভাল থাকা হল না বলো?

শুনেছি 'জীবন মৃত্যুর কাছে ধার করা' কিন্তু তাই বলে এত তাড়াতাড়ি সব ঋণ চুকিয়ে দিয়ে চলে গেলে? আমাদের মাথার উপর থেকে একটা হাত সরে গেল। তাতে তোমার কি? তুমি তো এই সংসার থেকে ছুটি নিয়ে নিয়েছ চিরতরে।

জানো মৌদি, তোমার প্রাণের প্রিয় রবি ঠাকুরকে স্মরণ করতে গিয়ে মনে পড়ে গেল, কোনও এক অনুষ্ঠানে শান্তনুদার পাশে বসে তুমি গাইছিলে—

'আকাশ ভরা সূর্য-তারা,/বিশ্ব ভরা প্রাণ, /তাহারি মাঝখানে আমি/পেয়েছি মোর স্থান' —সেই প্রাণ আর আমাদের মাঝে নেই, ঈশ্বরের মাঝে বিলীন হয়েছ তুমি।

আকাশের ঠিকানায়

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

হুগলির কারবালার বিবেকানন্দ পল্লি। ১৯৮৭-এর এপ্রিলের এক বিকেল। ছেলেটি মোটর সাইকেলের হর্ন বাজাল, আবারও। হর্ন বাজলেই প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মত জানালার পর্দা সরে যায়। এক যোড়শীর স্বাগত হাসি। মোটর সাইকেল রেখে ছেলেটি ঢুকে পড়বে বাড়ির মধ্যে। ঐ মেয়েটিকে ছেলেটা পড়াতে আসে।

আজ কিন্তু পর্দা নড়ল না। সদ্য ২০/২১ পেরোন ছেলেটি খুব ধীরে দরজার দিকে এগোল। দরজা খুললেন বাড়ির কর্ত্রী।

— এসো। (খুবই নিঃস্পৃহ গলা।)

— মাসিমা...

— বল

— মানে, আজ মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরিয়েছে।

— তো?

— মানে, আমি মৌ-এর জন্য একটা ঘড়ি এনেছি। ও নিশ্চয়ই ভাল করেছে।

— তুমি তো ওকে অঙ্ক করাও। ও ৪২ পেয়েছে অঙ্কে (কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গ)।

ঝাঁকড়া চুলের যুবক কুঁকড়ে গেল লজ্জায়।

— ঠিক আছে, ঠিক আছে... এরকম তো হবার কথা নয়... বিড়বিড় করতে করতে কোঁকড়া চুলে হাত বুলোতে বুলোতে ছেলেটি বাড়ির বাইরে এসে মোটরসাইকেল চাপল।

পাঠক নিশ্চয়ই একটি মিষ্টি প্রেমের গল্প ভাবছেন। সত্যিই তো তাই। সত্যম ও মৌ। ভরসা ও ভালোবাসার বন্ধনে আবিষ্ট। পরস্পর যেন পরস্পরের জন্য। সত্যমের লেডি লাক মৌ মৌসম। যার যেমন স্বপ্ন, তার তেমন ভাগ্য। স্বপ্ন দেখতে জানতে হয়। ভাগ্য নিজের হাতে তৈরি করে নিতে হয়। গত শতকের আট-নয়ের দশকে গৌতমদা, সত্যম স্বপ্নের ইমারত তৈরিতে ব্যস্ত ছিল।

আকস্মিক ঝড় এল। এক দুরারোগ্য অসুখে আক্রান্ত মৌ। তখন সত্যমের লড়াই মৌ এর জীবনকে 'বড়ী' এবং 'লম্বী' বানানোর। ভালোবাসা হারিয়ে দিল কর্কট ব্যাধিকে। তারপর সিনেমায় যেমন হয়। ভিলেনকে ঢিসুম ঢিসুম দিয়ে সুখী দম্পতি সুখে দিন কাটাতে লাগল। ঘরে নতুন অতিথি এল ঋষি।

আমরা যারা একসঙ্গে পড়াশুনা করেছি, তাদের মধ্যে সফলতম সত্যম। শুধুই একজন সফল, বিত্তবান শিল্পপতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য বলে নয়। হৃদয়বান, সৎ মনের মানুষ বলেই চুম্বকের মত টানে সবাইকে। অন্যদিকে মৌ ঘরে-বাইরে সমান স্বচ্ছন্দ। পত্রিকার সম্পাদনা হোক বা সিনেমার প্রযোজনা বা অতিথির পছন্দ বুঝে রান্নায় তাক লাগানো, গড় গড় করে রবীন্দ্রনাথ মুখস্থ বলা মৌ তুমি তো সোজা মানুষ নও! স্মৃতির পটে জীবনের ছোট ছোট ছবি আছে। প্রেমজ বিয়েতে সমস্যা, নব দম্পতি ঘরছাড়া। সদ্য পরিণীতা তমালীদিকে নিয়ে ভাড়া বাড়ি খোঁজে মৌ। হুগলি, চুঁচুড়ার গলি, তস্য গলিতে হানা। সফল হল। জীবনের সব কাজেই যেমন হয়েছে ও।

ভালবাসার দিনে দেখা হল হুগলির বাড়িতে। ১৪ই ফেব্রুয়ারি ২০২৪, উপলক্ষ সরস্বতী পুজো। গৌরব, করুণা, প্রিয়দর্শিনী, সুব্রতদা, শিবাজী পিছনে লাগা, কৌতুক। সবাই হাসছে। আরও অনেকে। মধ্যমণি মৌ। মাতিয়ে দিল আমাদের।

৭ই মে সকালের এক দুঃসংবাদে মনের মধ্যে হাহাকার। আপাদমস্তক ভালোবাসার মেয়েটি চলে গেল অন্যলোকে। নিস্পন্দ মৌয়ের সঙ্গে দেখা হল এফ ই ৪৯৮-এ। সম্রাজ্ঞীর মতো লাগছে ওকে। হাত লাগালাম ওকে ঘরে ঢোকাতে। বাইরে তখন জনঅরণ্য।

তারপর কেওড়াতলা। প্রিয়দর্শিনী কাঁদছে, বলছে ও দ্বিতীয়বার মাতৃহারা হল। ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে সত্যম। সব হারিয়ে বসে আছে ও। ঋষি নিষ্পলক। কাঁদছে পাপান। কেওড়াতলাতে জনসমুদ্র। বৈশালী, প্রত্যুৎদা, গৌরব, দুই শিবাজী, সাহেব, ভুটান-এত বিষন্ন এক পরিমণ্ডল।

কেওড়াতলা থেকে বেরিয়ে হুগলির দিকে চললাম। বিদ্যাসাগর সেতুতে এসে একবার দাঁড়ালাম, গঙ্গায় দূরে দূরে নৌকা বা ছোট ছোট জলযান বিন্দু বিন্দু আলো। আকাশের দিকে তাকালাম। নিকষ কালো অমাবস্যার রাত যে এত বেদনাহত হয় আগে জানতাম না।

তোর ঋণ শোধ হবে না কোনওদিন

সুনৃতা মিত্র

মৌ, কিছুতেই মানতে পারছি না তুই নেই। আমার ছোট্টবেলার বন্ধু। তোর জায়গা কেউ নিতে পারবে না রে। আমাদের মা দুর্গা। আমাদের অনুপ্রেরণা, শক্তি, যার জন্য ভালবাসা-শ্রদ্ধা ছাড়া আর কিছু নেই। মনে হত, মৌ সব সমস্যার সমাধান করে দেবে। তোর ঋণ কোনওদিন শোধ করতে পারব না। তোকে জীবনে পাওয়া একটা আশীর্বাদ রে। যেখানে থাকিস ভাল থাকিস। অনেক ভালবাসা।

ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ...

নবনীতা রায়চৌধুরী

সকলের জন্য যে অফুরান ভালবাসার ভাণ্ডার তোমার গভীর প্রাণের গোপন কুঠুরিতে সংরক্ষণ করে রেখেছ, তা তোমার শরীরের সঙ্গে নিয়ে চলে যেতে পারোনি বউদি। সপাট এক বেত্রাঘাতে অনিবার্য ভাবেই তার খনন শুরু হল ৭ মে ২০২৪, সকালে। মনের গবাক্ষের খড়খড়ি তখন থেকেই স্বয়ংক্রিয় হয়ে প্রতি পলেই আলো-আঁধারি করে তুলছে স্মৃতির উঠোন। বুঝতে পারছি তোমার স্নেহের শিকড়ের আলো বোধের গভীরে ঢুকে আমায় আবার অঙ্কুরিত হতে শক্তি জোগাচ্ছে, শোক শিথিল করে, তোমার প্রতি নির্ভরতা আরও বাড়িয়ে আগামীর কাজের প্রতি তীক্ষ্ণধী হতে বলছে তোমার নির্নিমেষ দৃষ্টি। আমার ব্যক্তিগত গানবাজনা নিয়ে সে কত কত যে পরিকল্পনা তুমি ধারণ করতে, তার একাংশও আমি পূরণ করতে পারিনি স্বভাবগত চরম উদাসীনতায়। আমার এই শিথিল মনোভাব তোমায় বিদ্ধ করেছে, তবু আবার বুঝিয়েছ। শান্তনু ও আমার ছোট্ট গানবাজনার পরিবার, রবির ঘর-এর প্রতি আমার অতি নিমগ্নতা যে আমায় ক্লান্ত করছে, তা নিয়েও বহুবার সচেতন করেছ। আমার কণ্ঠের যত্ন, রেওয়াজ, ব্যক্তিগত গানবাজনাকে পেশাগত গুরুত্ব দেওয়া ইত্যাদি সবদিকে তোমার ছিল বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। একেক সময় ভেবেছি, হুগলির এক মফস্সলে গান ঘরানার বাইরে বেড়ে ওঠা সাধারণ মেয়ে হয়ে তুমি গানবাজনার এত খুঁটিনাটি বিচার কীভাবে করতে পারো? পরে বুঝেছি, ঈশ্বরপ্রদত্ত এক সাঙ্গীতিক মেধা ও শ্রুতিধ্যান তোমার গান শোনার অভ্যাসকে একমুখী করেছে। পরবর্তীতে বহু গুণিজন-সঙ্গ তোমায় ঋদ্ধ করেছে। সেই ওঠাবসা থেকেই তুমি নিজেও খুব সহজে যে কোনও গান শিখে অবলীলায় গেয়ে দিতে পারতে।

বড় তৃপ্তিকর এই যে, আমাদের সম্পর্কের সেতুবন্ধন করেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাই দু'জনেই দু'জনের কাছে ভেঙেচুরে প্রতিবারই আবার খলবলিয়ে উড়িয়ে দিতাম আনন্দ-হইচই, হাসি-গানের রঙিন ফানুস। নির্ভরতার রস একটু একটু করে সুড়ঙ্গের ছিদ্র বেয়ে টইটম্বুর করে নিত মনকলস পাত্রটি। খোলা বাতায়নে বসে তখন চলত দু'জনের হাসির দমকে খুঁটিনাটি মশকরার ফোয়ারা।

৫ মে, রবিবার মধ্যরাতে, তোমার সঙ্গে শেষ ৩ মিনিটের ইঙ্গিতময় চোখের কথায় সেই বোঝাপড়া মজবুতি পেয়েছে, সঙ্গোপনে ঢেকে রেখেছি তোমার শ্বেতশুভ্র মুক্তহিয়ার পরশখানি।

কঠিন শাসনেও দ্বিধা ছিল না

শান্তনু রায়চৌধুরী

সম্পর্কের কত রঙ হতে পারে, তা বুঝিয়ে দিলেন, আর সেই সকল রঙকে এক লহমায় বিষাদের রঙে রাঙিয়ে স্তব্ধ করে পাড়ি দিলেন আনন্দ যাত্রায়। কয়েক হাজার নাবালককে সাবালক করে দিয়ে, আরও বড় দায়িত্ব সামলাতে এগিয়ে গেলেন।

জীবনের এই যাত্রাপথে এমন সম্পর্ক আর সম্ভব হবে কি না জানা নেই। এই ঘোর কলিতে মাতৃত্বের সকল আঙ্গিক কী রূপে পালন করতেন আপনি, ভাবলে তার তল খুঁজে পাই না।

কিছুটা আঁচ পাওয়া গেল সাত তারিখ সকালে, আপনার এক ঘর থেকে আর এক ঘরে হারিয়ে যাওয়ার পর। কয়েক'শ মানব শরীর তখন হাতড়ে বেড়াচ্ছে। কেউ মৌ খুঁজছে, কেউ দিদি, কেউ বোন, কেউ পরম বন্ধু, কেউ কন্যা, কেউ বা মা। কিছুতেই কেউ তাদের বহু মূল্যের এই সম্পর্ককে হারাতে চাইছে না। কেউ বুঝতেই চাইছে না, আপনি যে আরও অনেক বড় দায়িত্ব পালনের ব্রত নিয়ে আর এক ধামে এগিয়ে গেলেন। মাতৃশক্তি কত গভীর, কত দুর্দমনীয় হতে পারে তার পাঠ দিয়ে এগিয়ে চললেন।

গত পঁচিশ বছর ধরে ব্যক্তি জীবন চর্চা আপনার কঠিন অনুশাসনে শিখিয়েছে অনেক কিছু। জানি না কেন, প্রথম দিন থেকেই আপনার মান-অভিমান গভীর সুরে মান্যতা পেয়ে এসেছে শান্তনুর জীবনে। আপনি ছিলেন নিঃশর্ত শুভাকাঙ্ক্ষী। শান্তনুর তিল-ত্রুটি আপনার অনুভূতিকে স্পর্শ করত। কিছু না ভেবে মাতৃস্বরূপ হয়ে কঠিন শাসন করতেও কখনও দ্বিধান্বিত বোধ করেননি।

এখন ঠিক এই সময় আপনার মানব শরীরের অনুপস্থিতি প্রতি মুহূর্তে আমাকে জানান দিচ্ছে।

নতুন করে বুঝিয়েছিল রাখির মহিমা

বিপ্লব গাঙ্গুলি

ষাটোর্ধ্ব দাদার প্রায় দশ বছরের ছোট বোনের জন্য যে কোনওদিন তার পার্থিব কর্মলীলার অবসানে কিছু লিখতে বা বলতে হবে, যা আদতে করছি, ন'দিন পরেও এক বিভীষিকা। তেমন কিছু লিখতে পারব বলে মনে হয় না। মৌ যে কোথা থেকে এত জীবনীশক্তি পেত এবং আমাদের সকলের মধ্যে এত সহজে ছড়িয়ে দিতে পারত, সেটা আজও আমার কাছে একটা বিস্ময়। অফিসের সকলে জানত, ম্যাডাম এসেছেন মানে কাজকর্মের কড়া হিসেব নেওয়ার মধ্যেও সবার খবর নেবেন, গল্প করবেন, শিশুর সারল্যে নানা রকম খাবার সকলের সঙ্গে ভাগ করে খাওয়ার জন্য অর্ডার করবেন। বোঝার জো ছিল না, টেকনো ইন্ডিয়ার মতো এই মহীরুহের তিনি কর্ণধার এবং তাঁর স্বামী সত্যম রায়চৌধুরীর স্বপ্নের এই বিরাট কর্মযজ্ঞে তিনি তাঁর ৪০ বছরের সঙ্গী, অনুপ্রেরণা। সত্যমের ঘরনি আর আমার ঋষির আদরের মা হিসেবে মৌ ছিল তুলনাহীন। বন্ধুবান্ধব, চেনাপরিচিত, খেলাধুলো, সাংস্কৃতিক বা সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে অতি পরিচিত সব মুখ থেকে শুরু করে সরকারি আমলা, আধিকারিক, সারা দেশের সাংবিধানিক বা প্রশাসনিক প্রধান, বা পাশের বাড়ির ছোটবেলার আদরের মাসিমা, কাকিমা— সবার কাছে মৌ ছিল চুম্বকের মতো। সত্যমের যে-কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে সে ছিল চিফ ইভেন্ট ম্যানেজার। মৌ-এর কাছ থেকে ফোন বা মেসেজ এলে নেহাত খুব অসুবিধে না হলে সব্বার আসা একরকম পাকা বলেই ধরে নেওয়া হত।

জন্মস্থান, সত্যমের সঙ্গে আলাপ, দীর্ঘ দশ বছরের প্রেম এবং তিরিশ বছরের বিবাহিত জীবনের সাক্ষী হুগলির চুঁচুড়া আজ নীরবে কাঁদছে। যেমন অঝোর ধারা নেমেছে কলকাতা, দেশ-বিদেশে। মৌ আমার ব্যক্তিজীবনে এক বিরাট শূন্যতা রেখে গেল। আমাদের বাড়িতে কোনও দিন রাখি আদানপ্রদানের চল ছিল না, ভাইফোঁটা অবশ্যই ছিল। মৌ আমাকে নতুন করে বুঝিয়েছিল রাখি উৎসবের মহিমা। ভাইফোঁটা ছিল মৌ-এর কাছে মন ভাল করা উৎসব। সে-সব আজ সোনালি ফ্রেমে স্মৃতিবন্দি। মৌ সবসময় সুস্থ থাকত না, তা সত্ত্বেও সব কাজ করত, সেবা-যত্নে কোনও খামতি রাখত না, সব অনুষ্ঠানে যেত। বাড়ির অনুষ্ঠানে সিংহভাগ দায়িত্ব। আরেকটা বড় গুণ ছিল, খুব সোজা কথা বলত। কখনও কারও সঙ্গে কোনও কারণে যদি ভুল-বোঝাবুঝি হত, সেটা বুঝিয়ে দিয়ে সব কিছু ঠিক করে দিত।

এত কিছু লিখলাম একটা জিনিস বোঝাতে। জানি না পারলাম কি না, মৌ ভালবাসতে পারত, সবাইকে, খুব সহজে। মৌ আলোর মতন, ওর সুন্দর হাসির মতন, হাওয়ার মতন, ঢেউয়ের মতন, কুসুমগন্ধ রাশির মতন ভেসে চলে গেল— আমার মতো শতসহস্র মানুষকে যন্ত্রণায় বিদ্ধ করে। রবীন্দ্রনাথের কথায় আমি মৌ-কে বলব না 'তুমি রবে নীরবে'। মৌ আমার কাছে সদাজাগ্রত, সরবে।

গত বছর বোন চলে গেল, এ বছর দিদি

সাহেব চট্টোপাধ্যায়

মৌ রায়চৌধুরী অন্যদের। আমার দিদি। সোমবার থেকে হাসপাতালে ছিলাম, দিদির পাশে। কী বলব? দিদিকে অসময়ে হারিয়ে ভাই কী বলতে পারে? আমার যে বড্ড ক্ষতি হয়ে গেল! যখনই কোনও সমস্যায় পড়েছি, পাশে পেয়েছি। নিজের ভাই আর আমার মধ্যে কোনও দিন কোনও ফারাক করেননি। প্রতি রাখিতে হাতে রাখি পরিয়ে ভাইয়ের শুভকামনা করতেন। ভাইয়ের আয়ু চেয়ে ভাইফোঁটা দিতেন। খুব কম মানুষ এত উজাড় করা ভালবাসা পায়। যতদিন কাছে ছিলেন, আগলে, জড়িয়ে থেকেছেন। তাই সেই বাঁধন আলগা হতেই অন্তরে টান পড়েছে। মৌদির মতো ভালবাসতে আমি আজও আর কাউকে দেখলাম না। তুতো বোনের মৃত্যুতে খুব ভেঙে পড়েছিলাম। মৌদি মাথায় হাত রেখেছিলেন। এবার নিজেই চলে গেলেন। কার কাছে সান্ত্বনা খুঁজব?

মৌ স্বাক্ষর

নীলোৎপল সেন

‘আপনি একদিকে দেখেন ‘আজকাল সুস্থ’, আর অন্যদিকে দেখেন ‘আজকাল সফর’। একটায় আপনি রোগভোগের কথা বলে মানুষকে সাবধানি হতে বলছেন, আর অন্যটায় সব বাঁধন ছিঁড়ে, ঘর ছেড়ে অসাবধানি। এটা একটু বাড়াবাড়ি রকম বৈপরীত্য নয় কি?’

‘বৈপরীত্য কেন বলছ? দুটোর মধ্যে কিন্তু সরাসরি একটা যোগাযোগ আছে!’

‘কেমন?’

চোখের সামনে থেকে চুলটা কানের পাশে ঠেলে, চোখেমুখে একটা দুষ্টু হাসি নিয়ে মৌ ম্যাডাম বললেন, ‘সুস্থ’ হয়ে উঠে, হাওয়া বদলের জন্য সবাইকে ‘সফর’ করতে বলছি!

ম্যাডামের ‘রেডি উইট’ দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এই ছিলেন মৌ ম্যাডাম। যা-ই করতেন বা বলতেন, তার মধ্যে একটা নিজস্ব স্বাক্ষর থাকত, আমি মনে মনে তাঁর নাম দিয়েছিলাম ‘মৌ স্বাক্ষর’।

২০২৩। দুর্গাপুজো শেষ। ম্যাডামকে হোয়াটসঅ্যাপ-এ বিজয়ার শুভেচ্ছা জানালাম। চারদিনের মাথায় উত্তর এল। শেষ লাইনে লেখা, ‘টেকনোর ক্যালেন্ডার নিয়ে একটু চিন্তার মধ্যে আছি, তাই উত্তর দিতে দেরি হল।’ আমি একটু ভেবে একটা ক্যালেন্ডার আইডিয়া শেয়ার করে বললাম, ‘এটা করতে পারেন। খুব ইন্টারেস্টিং হবে।’ উত্তর এল হেমন্তকালের শেষে, ‘বুঝলে, তোমার আইডিয়াটাই ভাবছি ক্যালেন্ডারে করব।’

আমি একটা স্মাইলি উপহার দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাডামের আরেকটা মেসেজ ঢুকল, ‘শোনো, তোমার মাথায় কখনও কোনও কিছু এলে, আমার সঙ্গে একটু শেয়ার কোরো তো। সেটা যে-কোনও বিষয় হতে পারে। আমি ভাবব।’ আমি একটা থাম্বস আপ দিলাম। আবার আরেকটা মেসেজ, ‘এটা তোমার সঙ্গে আমার একটা অলিখিত চুক্তি হল কিন্তু!’ অফিসে কাজের মধ্যে ছিলাম, অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে লিখে দিলাম, ‘মৌ-এর সঙ্গে মৌ স্বাক্ষর হল তবে?’ পরমুহূর্তে ম্যাডামের ফোন। হ্যালো বলার পরেই অন্য প্রান্তে ওঁর উদাত্ত কণ্ঠে হাসি, ‘এটা দারুণ দিলে কিন্তু!’

সোশ্যাল মিডিয়ার মিমের তাণ্ডবে বাঙালির রসবোধ যেখানে তলানিতে ঠেকেছে, সেখানে ম্যাডামের রসবোধ সত্যিই অবাক করেছিল আমাকে। কিন্তু এটাই তো মৌ স্বাক্ষর! যেটা ওঁকে সবার থেকে সবসময় আলাদা করে রাখত।

আলোমানুষ, এক ভালমানুষ...

শুভজিৎ দাস

‘মৌ রায়চৌধুরী কলিং’, মোবাইল ফোনের বুক জুড়ে জ্বলতে-থাকা আলোর শব্দ! আর দেখা-শোনা হবে না! ফোনের মধ্যে দিয়ে ‘আমার মল্লিকাবনে’ পেরিয়ে তাঁর ‘হ্যালো’য় পৌঁছোনো হবে না! হ্যাঁ, ‘হ্যালো’ই বটে, হাসির ‘হ্যালো’, বাঁশির ‘হ্যালো’! হ্যালো তো একরকমের আলো, আর আলোর মতো এক মানুষের নাম মৌ রায়চৌধুরী! আমাদের ‘ম্যাডাম’! না, আজ বরং ম্যাডাম না বলে বলি ‘মাদাম’! মা-দাম! মায়ের মতো দামি! মায়ের মতোই ভাল! মোমের মতো মন যাঁর জ্বলতে জ্বলতে গলে, আর আগলে রাখে আলো! যে আলোয় আশ্রয় পেয়ে মন্দও ভাল হয়ে ওঠে। এই যেমন আমি! আমার কতশত মন্দ তাঁর আলোক-আশ্রয়ে ভাল হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছে! করেছে কেন বলছি! করে, করবেও। কারণ ‘ম্যাডাম নেই’, এটা আমায় স্বয়ং ম্যাডামও বিশ্বাস করাতে পারবেন না! হাসিমুখে তাঁর ঘুমিয়ে-থাকা শরীরটা যখন চুল্লির আলোর মধ্যে ঢুকে গেল, আমি ঠায় তাকিয়ে দেখলাম, আলোর সঙ্গে আলোর এক মহামিলন। যতবার চিৎকার করে গেয়েছি ‘মিলন হবে কতদিনে’, ততবার এক মায়াবী আলোর জল তাঁর চোখ থেকে নেমে গাল বেয়ে তাঁর ঠোঁটের হাসি হয়ে গেছে। আর সেই হাসির বাগানে বসে আমরা অনেকেই মানুষফুলের গন্ধ কেমন হতে পারে, তা অনুভব করেছি। ‘আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে’ এই উচ্চারণ পরিবর্তিত হয়ে তাঁর কাছে হয়েছিল, ‘সবার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে’। আমরা সবাই ওঁর সন্তান ছিলাম। আছি। মা, থাকবও! আমার প্রতিদিনের রুটিনে কাজের মাঝেমাঝে ওঁর নির্দেশ, গল্প, পরিকল্পনায় আগামীর অ্যাজেন্ডা তৈরি হত। বই বিভাগের দায়িত্ব আমার কাঁধে আসার পর সেই কাঁধে অবিরাম তাঁর হাত ছিল বলেই পাঠকের মনের মুদ্রা দুই মলাটে আমরা মুদ্রিত করতে পেরেছি! শারদ সংখ্যায় নতুনভাবে রং ঢেলে দিয়েছেন তিনি ও তাঁর অনুরাগ। আপাদমস্তক রবীন্দ্রনাথে মজে-থাকা এক মানুষ জীবনকে যাপন করেছেন সমভিব্যাহারে। গান, কবিতায় নিবেদিতপ্রাণ, হঠাৎ একদিন লিখে ফেললেন একটা গল্প! পাঠালেন আমায় যেমনটা পাঠিয়ে থাকেন। পাঠাবেনও। সেই গল্পে দেখলাম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যখন দেখা হচ্ছে তখন তিনি ঘুমে আচ্ছন্ন। আহা! কী আরামের সেই ঘুম যেখানে প্রিয় মানুষের সঙ্গে থাকা যায়। তাঁকে ছোঁয়া যায়। তিনিও তাঁর গল্পে রবীন্দ্রনাথকে দেখছেন, পাশে বসছেন, কথা বলছেন! তাঁর লেখা জীবনের প্রথম ও শেষ সেই গল্প, কে জানত, তা আসলে ‘গল্প হলেও সত্যি’ হয়ে যাবে এত তাড়াতাড়ি। বাংলা দৈনিকের প্রথম পাতায় তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এভাবে দেখা হয়ে যাবে! আর আমরা তাকিয়ে থাকব সেই ‘দেখা হওয়া’র দিকে। ঠিক যেমন আমরা জীবনের কিছু চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকি আর টের পাই সেই চলে যাওয়ার মধ্যে রয়ে গেল এক চিরন্তন থেকে যাওয়া। ম্যাডাম থেকে গেলেন! আমরাও রেখে দেব, মনে রেখে দেব। হৃদয়ে মম...

হাসির আলো জ্বালিয়ে তবে,
আঁধার বুঝি সাঙ্গ হবে।
জীবন যখন গাইছে আলো
হাসুক সবাই বাসতে ভালো!

মেনেই নিলাম না

মুনমুন চক্রবর্তী

কী লিখি, কী লিখি— কিছুতেই কলম থেকে কিছু বার করতে না পেরে সেই প্রথম দিনের মৌ-এর গল্প মনে পড়ল। সেটাই তো মৌ-কে প্রথম আলাপ ও চেনা! সেটা দিয়েই চেষ্টা করি। মৌ-এর তখন একটা দুরন্ত ছোট্ট ছেলে। আমরা প্রথমবার আলাপ করতে এসেছি। সোফায় বসে, দেখছি টেবিলে সব খাবার সাজানো। হঠাৎ ঋষির সীমাহীন আশ্চর্যের প্রশ্ন আমার কর্তাকে, 'তোমার চুলগুলো কোথায়?'

উত্তর এল— 'সঅঅঅব পড়ে গেল।'

নীচে তন্ন তন্ন করে দেখে এবারের প্রশ্ন এল— 'কই দেখছি না তো!!!'

মৌ-এর বিব্রত মুখ, কী ছেলে রে বাবা!

এই প্রথম দেখা মৌ-এর সঙ্গে। সেই মেয়েটাই আজ নেই হয়ে গেছে। এত দূরে বসে মেনেই নিলাম না একথা। মনে হয়, আজও গেলে সেই মেয়েটাই বসে যাবে চা আর মুড়ি-বাদামের আড্ডায়। এখনও, এবারেও তার হবে সেখানে নিত্য আনাগোনা।

এতদিনের বিদেশ বাসের থেকে যতবার গেছি, যত মানুষেরা নেই হয়ে গেছে— তারা সব ভিড় করে আসে, এবার তাদের সঙ্গে মৌ-ও আসবে সেই ভিড়ে?

এটা কি হওয়ার কথা রে?

একবার আমরা আর ওরা, দুই পরিবার মিলে থাইল্যান্ডে বেড়াতে গিয়ে অল্পের জন্য সুনামিতে ভেসে যাইনি। সেবারেও ছোট্ট ঋষির খাবারের ব্যবস্থা না করে সে নিজে কিছু মুখে তুলতে পারত না।

ও আর এবার থেকে হাসিমুখে এসে দাঁড়াবে না।

রাশি রাশি নেই-হয়ে-যাওয়া মানুষেরা দূর থেকে দেখে আমাদের।

এবার থেকে ও থাকবে সেই দলে।

রাজশাহীতে দুই বাংলার সাংস্কৃতিক উৎসবে

বাংলাদেশ একজন অকৃত্রিম বন্ধুকে হারিয়েছে

এ এস এম শামসুল আরেফিন

লোকমুখে শোনা, খারাপ সংবাদ নাকি বাতাসের আগে যায়। সেদিন কথাটা সত্যি হল। ৭ মে, সকালে দুঃসংবাদ পেলাম। এরপর নির্বাক হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছু করার ছিল না। আমাদের সকলের প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন মৌ রায়চৌধুরী আমাদের ছেড়ে অসীমের পথে যাত্রা করেছেন। বিষয়টি আমাদের পরিবারের জন্য খুব আকস্মিক ছিল। জেনেছিলাম, কিছুদিন যাবৎ অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। কিন্তু মৃত্যু যে তাঁর দরজায় দাঁড়িয়ে, তা আমরা কেউই ভাবতেও পারিনি।

মৌ রায়চৌধুরী সকলের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। শুধু ভারতে নয়, বাংলাদেশের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তিনি ছিলেন প্রিয় এবং পরিচিত একজন মানুষ। বাংলাদেশের সঙ্গে ছিল তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ। মধুর স্বভাবের কারণে এই মানুষটি যেন অজান্তেই সকলের আপন হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ সকলকে বিস্মিত করেছে।

২০১৩ সাল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেলপ্রাপ্তির শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে কুষ্টিয়ার শিলাইদহের কুঠিবাড়ি প্রাঙ্গণে আয়োজিত হয়েছিল 'গীতাঞ্জলী–১০০'। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল বাংলাদেশ–ভারত সম্পর্ক উন্নয়নে গঠিত 'ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশ' সংগঠনের পথচলা। ভারতের পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠানের নেতৃত্বে ছিলেন শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব শ্রী সত্যম রায়চৌধুরী ও তাঁর সহধর্মিণী মৌ রায়চৌধুরী। বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতায় এবং 'ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশ'–এর আয়োজনে এবং 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন'–এর অংশগ্রহণে ২০১৮ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় 'প্রথম আন্তর্জাতিক বাংলা সাহিত্য সম্মেলন'। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু–কন্যা শেখ হাসিনা তিন দিনের এই সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এবং ভারতের প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ২৫০–র বেশি শিল্পী–সাহিত্যিক এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশে আয়োজিত এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মৌ রায়চৌধুরীর গান, আবৃত্তি ও উপস্থাপনা ছিল মনোমুগ্ধকর।

দুই বাংলার মেলবন্ধনে মৌ রায়চৌধুরী নিজেকে বিভিন্ন ভাবে জড়িয়ে রেখেছিলেন। অংশগ্রহণ করেছেন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। তাঁর প্রযোজিত ছবি 'শঙ্খচিল' আজও দুই বাংলার মানুষের মনে জায়গা করে রয়েছে। বাংলাদেশের জাতির পিতার ওপর যৌথভাবে নির্মিত প্রামাণ্য চিত্র 'কলকাতায় মুজিব' এখন সম্পাদনায় রয়েছে। এটিই হবে বঙ্গবন্ধুর কলকাতায় ছাত্র ও রাজনৈতিক জীবনের কর্মকাণ্ডের ওপর নির্মিত প্রথম মূল্যবান দলিল। গুরুত্বপূর্ণ এই কর্মকাণ্ডে মৌ রায়চৌধুরী সার্বিক ভাবে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছিলেন। নানা ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি বারবার ছুটে এসেছেন এই বাংলাদেশে।

দীর্ঘদিনের এই পথচলায় শ্রী সত্যম রায়চৌধুরী ও শ্রীমতী মৌ রায়চৌধুরী দু'জনেই হয়ে উঠেছেন আমাদের পারিবারিক বন্ধু ও আত্মীয়। আমাদের মধ্যে অজান্তেই গড়ে উঠেছিল ভাই–বোনের মতো সম্পর্ক। আমার গবেষণার কর্মকাণ্ডে একদিন হাতে দিয়েছিলেন একটি ঝর্না কলম। আজ এই কলমটি বারবার আমার স্মৃতিকে নাড়া দিচ্ছে।

দীর্ঘ পরিচয় মৌ রায়চৌধুরীকে অনেক বেশি জানার সুযোগ করে দিয়েছিল। তাঁর বিনয়, শিক্ষা, কর্মদক্ষতা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। সাহিত্য–সংস্কৃতিতে গভীর অনুরাগের জন্য খ্যাতি ছিল তাঁর। চমৎকার কবিতা লিখতেন। বাংলাদেশের মানুষের কাছে মৌ রায়চৌধুরী অনেক ভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। আমরা যেমন একজন শুভাকাঙ্ক্ষী হারিয়েছি, তেমনই বাংলাদেশ তার একজন অকৃত্রিম বন্ধুকে হারিয়েছে।

শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করি...

নাজমা আরেফিন

প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে 'জন্মিলে মরিতে হবে' এটাই বাস্তব! তবে এ কেমন যাওয়া! তাঁর চলে যাওয়ার খবরটা শুনে আমি বড় রকমের একটা ধাক্কা খেলাম। তাঁর অসুস্থতার খবর আমরা পাইনি। কলকাতায় পরিচিত কেউ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে আমরা সবসময় খবর পাই। কিন্তু এ কেমন মৃত্যু! ভাবতে বড় কষ্ট হচ্ছে। চোখের সামনে ভেসে উঠল মৌ বউদির হাস্যোজ্জ্বল সুন্দর মুখখানি। কপালে লাল টিপ, হাতে নতুন নতুন ডিজাইনের শাঁখা, গলায় মঙ্গলসূত্র।

তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয় ২০১৩ সালে। 'ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশ', ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। সেবার অনুষ্ঠান কুষ্টিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল কুষ্টিয়া শিলাইদহ রবীন্দ্র কুঠিবাড়িতে। বিশাল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'গীতাঞ্জলি–১০০'। কুষ্টিয়ার মানুষ সেদিন ধন্য ধন্য করেছিল। দু'দিন ধরে কুষ্টিয়া উৎসবের শহরে পরিণত হয়েছিল। সেই থেকে আমাদের একসঙ্গে চলা। দেশে, বিদেশে ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশ–এর ভারত ও বাংলাদেশের সব অনুষ্ঠানে আমরা একসঙ্গে ছিলাম। গল্প করতেন, 'বাংলাদেশে যতবার যাই, জামদানি শাড়ি আমার কেনা চাই।' ঢাকাই জামদানি শাড়ি তাঁর পছন্দের ছিল।

দু'বছর আগে রাজশাহি ও নাটোরে ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। মৌ বউদি মনের আনন্দে ৪০ খানা রাজশাহি সিল্ক, গরদ ও তসর কিনেছিলেন। সবাইকে উপহার দেওয়ার জন্য কিনেছিলেন। তার মধ্যে আমিও ছিলাম। মানুষকে কিছু দেওয়ার আনন্দ তিনি বেশ উপভোগ করতেন। তিনি একজন খোলা মনের মানুষ ছিলেন। তাঁদের পারিবারিক সব অনুষ্ঠানে আমরা আমন্ত্রিত ছিলাম। দাদা–বউদি দু'জনেরই আন্তরিকতার কথা লিখে প্রকাশ করা যায় না। তাঁদের সান্নিধ্যে আমরা ধন্য ছিলাম। বউদির সঙ্গে বাংলাদেশে হোটেল সোনারগাঁয়ে আমার শেষ দেখা। আমার হাতে একটা প্যাকেট দিয়ে বললেন, 'এটা দাদার জন্য, একটা পাজামা–পাঞ্জাবি আছে।' যতবার তাঁরা বাংলাদেশে এসেছেন, আমার বাড়িতে এসেছেন। তাঁর মধ্যে কোনও ভণিতা কখনও দেখিনি। আমরা পারিবারিক ভাবে একজন ভাল বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীকে হারালাম। তাঁর কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত মেয়েদের তিনি বটগাছের ছায়ার মতো আগলে রেখেছিলেন। আজ তাঁরা অভিভাবকহীন হয়ে গেলেন। এ অভাব তাঁদের পূরণ হওয়ার নয়। তাঁর পরিবারেরও এ অভাব পূরণ হওয়ার নয়।

অল্প কথায় মৌ বউদিকে নিয়ে লেখা সম্ভব নয়। আমি তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

প্রথম সাক্ষাতেই বন্ধুসুলভ ব্যবহার মুগ্ধ করেছিল

আবদুল ওয়াদুদ দারা, প্রতিমন্ত্রী, বাংলাদেশ সরকার

টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের কো-চেয়ারপার্সন, সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটির গভর্নিং বডির সদস্য ও আজকাল দৈনিকের ডিরেক্টর, বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু মৌ রায়চৌধুরীর অকালপ্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত। সাহিত্য-সংস্কৃতিতে গভীর অনুরাগের জন্য খ্যাতি ছিল মৌ রায়চৌধুরীর। তিনি ছিলেন একজন উদারমনা বাঙালি লেখক। ২০২২ সালে রাজশাহি ও নাটোরে অনুষ্ঠিত পঞ্চম বাংলাদেশ-ভারত সাংস্কৃতিক উৎসবে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। প্রথম কথোপকথনেই তাঁর অনন্য শৈল্পিক গুণ ও বন্ধুসুলভ ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করেছিল। এই অনন্যসাধারণ লেখকের প্রয়াণে দুই বাংলার মেলবন্ধনের জায়গা দারুণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

দুই বাংলার সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনকে সুদৃঢ় করতে এক সাহসী সংগঠক

পঙ্কজ নাথ, এমপি

দুই বাংলার সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করতে এক সাহসী সংগঠক মৌ রায়চৌধুরী। সফল শিল্প-উদ্যোক্তা, উভয় বাংলায় শিক্ষা বিস্তারে নীরব পথিকৃৎ, স্বামী সত্যম রায়চৌধুরীর সুযোগ্য সহধর্মিণী, সঙ্গীতশিল্পী শ্রীমতী মৌ রায়চৌধুরী একাধারে ছিলেন শিল্প-সাহিত্যের দরদি, পৃষ্ঠপোষক, আবার শক্ত হাতেই হাল ধরেছিলেন কলকাতার সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটি, টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ, আজকাল পাবলিকেশন-এর সৃষ্টিশীল প্রকাশনার।

কবিতা যেখানে সঙ্গীতের রূপ নেয়, সেখান থেকে শুরু করে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রায় প্রতিটি অঙ্গনে যাঁর পদচারণা শুধু নয়, ছিল অনন্য অকৃত্রিম সহযোগিতা। দুই বাংলার শিল্পী-কুশলীদের নিয়ে তাঁর প্রযোজিত চলচ্চিত্র 'শঙ্খচিল' জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে। তাঁরই উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসা প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়, সাহেব চট্টোপাধ্যায় ও ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর উপস্থিতিতে রাজশাহি ও নাটোরে অনুষ্ঠিত পঞ্চম বাংলাদেশ-ভারত সাংস্কৃতিক মিলনমেলা ২০২২ পূর্ণতা পেয়েছিল।

Deeply Saddened

Aroma Dutt, MP

We all Friends and Well-wishers from Bangladesh are deeply saddened and shocked with the news of untimely demise of Ms. Mou Roychowdhury, Co-Chairperson of Techno India Group and Governing Body Member of Sister Nivedita University, who was simultaneously a leading entrepreneur and a cultural activist. I am confident that, Ms. Mou Roychowdhury will exist in all institutions which she was steering towards Center of Excellence.

দুই বাংলার মেলবন্ধনের জায়গা ক্ষতিগ্রস্ত হল

আশেক উল্লাহ রফিক, এমপি

সাহিত্য-সংস্কৃতিতে গভীর অনুরাগের জন্য খ্যাতি ছিল তাঁর। ছিলেন একজন লেখিকা। তার প্রকাশিত বইগুলি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছে। তাঁর সবচেয়ে বড় গুণটি ছিল তাঁর মধুর স্বভাব। গত বছর অনুষ্ঠিত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে তাঁর বোনের মতো স্নেহময়ী ব্যবহার আমাকে বিস্মিত করেছে। তাঁর প্রয়াণে দুই বাংলার মেলবন্ধনের জায়গা দারুণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল।

সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটির সমাবর্তনে

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা, কবিতা ছিল প্রেম...

ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশ

বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু মৌ রায়চৌধুরীর অকালপ্রয়াণে 'ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশ' শোকাহত। মৌ রায়চৌধুরী ছিলেন এই সংগঠনের 'ইন্ডিয়া চ্যাপ্টার'–এর প্রাণ। সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মধ্য দিয়ে দুই বাংলার মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় করতে সবসময় তিনি ছিলেন সচেষ্ট। শিলাইদহ, ঢাকা, রাজশাহি ও নাটোরের সফল অনুষ্ঠানগুলি তারই নিদর্শন। সংস্কৃতি জগতে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ ছিল। গুণ ও গুণীর কদর তিনি বরাবর করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা, কবিতা ছিল প্রেম। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলি সর্বত্র সমাদৃত ও জনপ্রিয়। বাংলা সিনেমার অত্যন্ত সফল প্রযোজক হিসেবেও মৌ রায়চৌধুরীর নাম চিরকাল উল্লিখিত হবে। মধুর ও মিষ্টি স্বভাব, আন্তরিকতা এবং আকর্ষণীয় চরিত্রের অধিকারী মৌ রায়চৌধুরীর প্রয়াণ দুই বাংলার মেলবন্ধনের ক্ষেত্রে এক অপূরণীয় শূন্যতা সৃষ্টি করল।

ঢাকায় আজকাল স্টলে। সঙ্গে নাজমা আরেফিন, নবনীতা রায়চৌধুরী ও সুমন্ত চ্যাটার্জি

অবিশ্বাস্য প্রস্থান

আবেদ খান

শেষ পর্যন্ত আমাকে বিশ্বাস করতেই হল যে, মৌ নেই। মৌ-এর সঙ্গে প্রথম দেখা টেকনো ইন্ডিয়ার কলকাতার অফিসে। হাসিখুশি-আন্তরিক-গরিমাহীন। এক ধরণের মানুষ আছেন, যাঁরা কথা বলেন হৃদয়ের কণ্ঠস্বর দিয়ে, আত্মার উষ্ণতা অনুভব করা যায়। মৌ রায়চৌধুরী ঠিক তেমনটি। আমার এবং আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়েছে একাধিকবার।

সেদিন সমাজমাধ্যমে যখন জানলাম মৌ আর নেই, তখনও বুঝিনি কোন মৌ। ছবি দেখে চমকে উঠলাম। মৌ! মৌ রায়চৌধুরী! সেই হাসিখুসি মেয়েটি! কী লিখব তাকে নিয়ে? মৌ, কেন এই অসময়ে চলে যাওয়া? কথা তো ছিল, ঢাকায় আমাদের বাড়িতে আসার। আসা হল না। আর দেখা হল না। ভাল থাকো, যেখানেই আছো।